প্রত্নচিহ্ন -র পরবর্তী সংখ্যার জন্য লেখা পাঠান। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ই জুলাই, ২০২০। লেখা পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন 8942924234 এই নম্বরে।
E-mail : ab.farque@gmail.com

প্রত্নচিহ্ন
PDF MAGAZINE

লেখকের বক্তব্য নিজস্ব। এজন্য প্রত্নচিহ্ন কমিটি কোনভাবে দায়ী নয়।

দ্বিমাসিক ৪ পাতা

১ম বর্ষ - ১ সংখ্যা ❑ ২২ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৪২৭ সন ❑ ৫ জুন, ২০২০

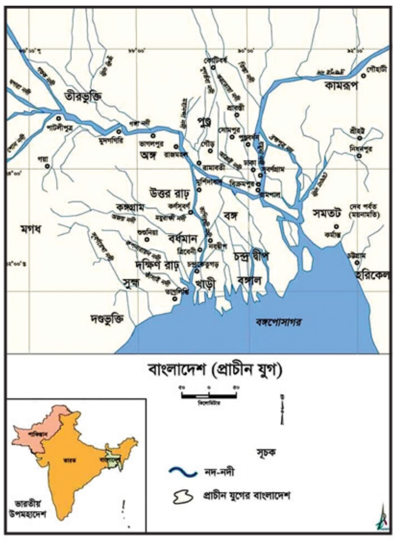
বাংলা-বাঙালি-বাংলাদেশ একটি পর্যালোচনা

ড. রাজর্ষি চক্রবর্ত্তী
ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

"নম নম নম বাংলাদেশ মম
চীর মনোরম চীর মধুর"

উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, উত্তর-পশ্চিমে রাজমহল পাহাড়, দক্ষিণে- পশ্চিমে ছোটনাগপুর মালভূমি, পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে গারো-খাসি-জয়ন্তিয়া- আরকান পাহাড় ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর -এই বেস্টনীর মধ্যে অবস্থিত গঙ্গা-পদ্মা- ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমিকেই আমরা বাংলা বলি। এই সমভূমির বেশিরভাগটাই গঠিত হয়েছে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র- পদ্মা -মেঘনা বাহিত পলিমাটিতে। যেহেতু পাহাড়- পর্বত-সমুদ্র এই অঞ্চলকে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা করেছে তাই এই অঞ্চলে এক স্বকীয় ভাষা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সুপ্রাচীন কাল থেকে। প্রাচীন কালে বাংলা অবশ্য বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন - পৌন্ড্রবর্ধন, সমতট, হরিকেল, গৌড়, বঙ্গাল ইত্যাদি। রাজনৈতিক ভাবে এই অঞ্চল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজা-মহারাজা-ভূঞা -নবাব-জমিদারের অধীন থাকলেও ভাষা- সংস্কৃতির দিক দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষজন সবসময় নিজেদের মধ্যে একাত্বতা অনুভব করেছে।

উত্তর ভারতের তুলনায় বাংলায় আর্যকরণের সূচনা হয় অনেক পরে। দীর্ঘদিন বাংলা ছিল আর্য প্রভাব মুক্ত, অনার্য জাতি অধ্যুষিত। প্রথম আর্য ধর্মগুলির মধ্যে জৈন ধর্ম বাংলায় বিস্তার লাভ করে। আর্যজাতি দুটি পথে বাংলায় অনুপ্রবেশ করে। উত্তর-পশ্চিমে রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণ থেকে যে জায়গা দিয়ে গঙ্গা বাংলায় প্রবেশ করেছে, তার মধ্যবর্তী স্থান সমতল ভূমি। এই জায়গা দিয়ে আর্যগণ বাংলায় প্রবেশ করে। দ্বিতীয় পথটি ছিল দক্ষিণে ছোটনাগপুর মালভূমির জঙ্গলাকীর্ণ পথ। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলা



পুরুলিয়ার পথে প্রান্তরে এখনো প্রচুর জৈনমূর্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই পথ যে শুধু জৈন ধর্মপ্রচারকরাই ব্যবহার করেছেন তাই নয়, জৈন ব্যবসায়িরাও এই পথে দীর্ঘদিন যাতায়াত করেছেন। জৈন প্রভাব এখনো বিভিন্ন স্থান নামের মধ্যে রয়ে গেছে। যেমন - বর্ধমান, বীরভূম ইত্যাদি। জৈন ধর্মের পর বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করে। বর্তমান ক্যালেণ্ডারে বৈশাখ মাস দিয়ে নতুন বছর শুরু হয়। আগে যেটা হতো তা হলো অগ্রহায়ণ ছিল নতুন বছরের প্রথম মাস। অগ্রে-আগে, হায়ণ-বছর। বছরের প্রথম ভাগ। এ সময় নতুন ধান, ফলত, নবান্ন হত। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে বাংলা বছরের প্রথমমাস 'অগ্রহায়ণ' পাল্টে গিয়ে স্থান নেয় 'বৈশাখ'। এ মাসের পূর্ণিমায় (৬২৩ খ্রীঃ পূঃ) বুদ্ধের জন্ম। বৌদ্ধ প্রভাবিত বাঙালির তাই বুদ্ধের জন্ম মাসকে অগ্রাধিকার দিতে 'বৈশাখ' মাসকে বছরের প্রথম মাস হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলার প্রথম সার্বভৌম নরপতি শশাঙ্ক - যার রাজধানী কর্ণসুবর্ণের (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার চিরুটি গ্রাম) পাশেই ছিল রক্ত মৃত্তিকা বৌদ্ধ বিহার। এই বিহারের খ্যাতি এতোটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে হিউয়েন সাং ভারত

এরপর ২ পৃষ্ঠায় ▸


নিমতিতা জমিদার বাড়ী, ছবি : সুব্রত বিশ্বাস

ত্রিপুরা - এক বর্ণময় ইতিহাসের হাতছানি

সুব্রত বিশ্বাস

২০১৬ সালের মধ্যভাগ। জানতে পারি ২০১৭ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ত্রিপুরার আগরতলায় স্থিত মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৪৮ তম Regional Science Conference and International Seminar। আর তদক্ষণাৎ আমি স্থির করি এই বিজ্ঞান মহাসভায় অংশ গ্রহণের।

এবারে আমার যাত্রা সঙ্গী মা, স্ত্রী ও স্নেহের ছাত্র সুদীপ্ত স্থির হয় আমরা আগরতলায় গিয়ে উঠবো নিকট আত্মীয় জীবনদা বাড়িতে।

খোঁজ নিয়ে জানতে পারি কলকাতা-আগরতলা বিমান যোগাযোগ থাকলেও, সদ্য কলকাতা-আগরতলা ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। ট্রেন পথের সময়সীমাও যথেষ্ট বেশী — প্রায় ৩৮ ঘন্টা, তথাপী রেলপথকেই আমরা মাধ্যম হিসাব বেছে নিই, শুধুমাত্র অসম উপত্যকা বা বরাক উপত্যকা নৈসর্গিকতা উপভোগ করার জন্য। পরিকল্পনা অনুযায়ী টিকিট কাটলাম শিয়ালদহ আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে।

ট্রেন রুটটি নতুন হওয়ায় সপ্তাহে দুই দিন ট্রেনটি শিয়ালদাহ থেকে আগরতলা ও আগরতলা থেকে শিয়ালদহ যাত্রা করে। ওদিকে Science Conference -এর সময়সীমা ৫ই জানুয়ারী থেকে ৭ই জানুয়ারী অর্থাৎ পরপর তিনদিন। কিন্তু সময়সূচী অনুসারে আমাদের আগরতলাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘায় টিকিট কাটতে হলে ১লা জানুয়ারী এবং ফিরতি পথের টিকিট কাটতে হল ১০ই জানুয়ারী। আর স্থির হয় Conference -এর আগে ও পরের ছুটির দিনগুলিতে আমরা ঘুরে নেব আগরতলা সন্নিকটস্থ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলি।



সূচী অনুযায়ী ২০১৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর রাত ১০টা ৪৫ মিনিট নাগাদ পৌঁছে যাই বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে। সেখান থেকে ১১টা ১০ মিনিট -এর শিয়ালদহগামী লালগোলা এক্সপ্রেস করে শুরু হয় আমাদের শুভযাত্রা। যখন শিয়ালদহ স্টেশনে নামলাম তখন প্রায় ভোর ৩টা ৪৫ মিনিট। যেহেতু আগরতলাগামী ট্রেন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে তাই স্টেশন চত্বরেই আমরা রইলাম অপেক্ষায়।

ইতিমধ্যে আমরা জানতে পারলাম যে বিশেষ কারণবশত আগরতলাগামী ট্রেনটি সেদিন ২ ঘন্টা দেরীতে ছাড়বে। সুতরাং অপেক্ষা যে আরো দীর্ঘতর হল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যাই হোক সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে আমরা ফিরলাম যাত্রা

এরপর ২ পৃষ্ঠায় ▸

সম্পাদকীয়

আপনাদের সকলের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা শুরু করতে চলেছি আমাদের পি.ডি.এফ. ম্যাগাজিন "**প্রত্নচিহ্ন**"-র পথ চলা। প্রত্নচিহ্ন শুধু জেলার ইতিহাস নয়। জেলা ও রাজ্যের বাইরে গিয়ে ভারতের ইতিহাস তথা বিশ্ব ইতিহাসের কথা বলবে। ইতিহাসকে কোন সীমার মধ্যে বেঁধে দিলে তা তার পূর্ণতা পায়না। ইতিহাস এক মহাসমুদ্র। যত ডুব দেবে তত জানবে তার বিস্তৃতির কথা। কত জানা অজানা তথ্য লুকিয়ে রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। সেই জানা অজানা তথ্যগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার ছোট্ট প্রয়াসের মাধ্যমই হল প্রত্নচিহ্ন। আশা করি আমরা প্রতিবার সঠিক ইতিহাস আপনাদের সামনে তুলে ধরে আপনাদের ইতিহাসের প্রতি ভালোবাসা আরও বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হব। আপনাদের ভালোলাগা, মতামত আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। প্রত্নচিহ্ন বর্তমানে দ্বিমাসিক পি.ডি.এফ. পত্রিকা। পরে আপনাদের সহযোগিতা ও আশীর্বাদ পেলে আমরা একে মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশ করব।

▶ ১ পৃষ্ঠার পর

বাংলা-বাঙালি-বাংলাদেশ একটি পর্যালোচনা

পরিভ্রমণকালে এই বিহারে এসেছিলেন।

ইতিহাস বলে যে রাজা শশাঙ্কের শাসনকালে হর্ষবর্ধন বহু চেষ্টা করেও বাংলা দখল করতে পারেননি। এটি বাঙালির বীরত্বের প্রমাণ। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর এক শতক বাংলায় মাৎস্যান্যায় চলে যার অবসানকল্পে প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালকে রাজা নির্বাচন করে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে ইউরোপে নির্বাচন ব্যবস্থার সূচনার বহু পূর্বেই (ফরাসি বিপ্লবের পর ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে লুই ফিলিপ ফ্রান্সে রাজা নির্বাচিত হন) বাংলায় রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন গোপাল। এই গোপালই পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের রাজা ধর্মপাল ও দেবপাল বাংলার বাইরে এক বিশাল অঞ্চল নিজের শাসনাধীনে আনেন। ধর্মপালই নির্মাণ করেন বৌদ্ধ গয়ায় মহাবোধি মন্দির। এছাড়াও তিনি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন।

পালদের পর বাংলায় শাসন করেন সেনরা। এই সেন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেব ছিলেন সেন রাজা লক্ষণ সেনের সভা কবি। ইতিহাস বলছে লক্ষণ সেনের সময়েই পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন মুহম্মদ ঘুরির এক সেনাপতি ইক্তিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি। সেটা সম্ভবত ১২০২/০৩ খ্রীষ্টাব্দে। পূর্ব বাংলায় এর পরেও বেশ কিছু দিন সেন বংশ ও চন্দ্র বংশের শাসন চলেছিল। *(ক্রমশ)*

▶ ১ পৃষ্ঠার পর

ত্রিপুরা - এক বর্ণময় ইতিহাসের হাতছানি

পথের মূল স্রোতে। ছাড়ল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস।

পথ মধ্যে সিগনাল ব্যবস্থার গোলযোগ থাকায় যখন আমরা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌছলাম, তখন প্রায় রাত ৮টা। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ট্রেন আবার ছুটে চলল অভিষ্ট লক্ষ্যে। এদিকে রাত হয়ে যাওয়ায় আমরাও যে যার মতো শুয়ে পড়লাম। পরের দিন সকাল ৮টা নাগাদ যখন ঘুম ভাঙলো তখন ট্রেন আসামে ঢুকে পড়েছে। সামান্য প্রাতরাশ পর্ব সেরে অপেক্ষায় থাকলাম বরাক উপত্যকার।

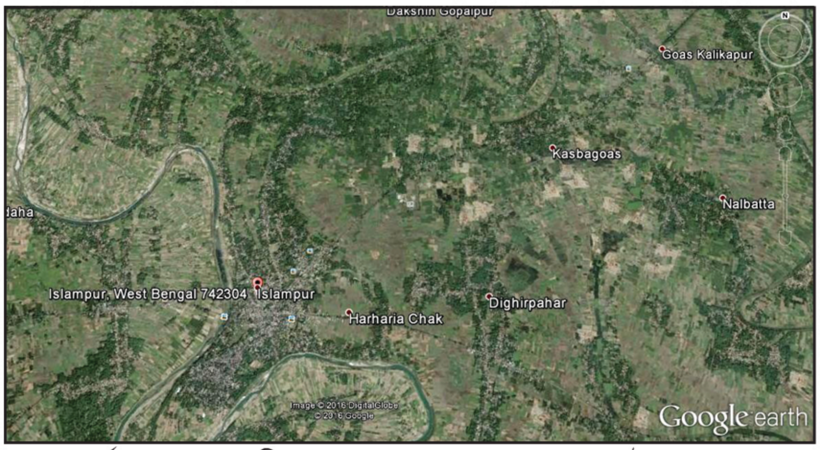
এরপর সকাল ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ ট্রেন পৌছল লামডিং স্টেশনে। ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীদের কাছে জানলাম এখান থেকেই শুরু হবে 'ট্রেন বরাক সফল'। স্টেশনে প্রায় ৩০ মিনিট দাঁড়ালো ট্রেনটি। জানলাম সেখান থেকে তিনটি ইঞ্জিনে চলবে ট্রেনটি। দুটি সামনে ও একটি পেছনে।

ট্রেন আবার এগিয়ে চলল সামনের দিকে। পথমধ্যে সাইন বোর্ডে দেখলাম ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি ৩০ কিমি./ঘন্টা। যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম ট্রেনটি প্রবেশ করছে এক পার্বত্য সুরঙ্গে। এক অসাধারণ অনুভূতি। এভাবেই একের পর এক পর্বত ভেদ করে সর্পিল পথে এগিয়ে চলল ট্রেনটি। সার্থক হল আমাদের ট্রেন সফর। যাত্রা পথের বিলম্ব জনিত কারণে রাত ১টা ৩০ নাগাদ পৌছলাম আগরতলা স্টেশনে। *(ক্রমশ)*

'গোয়াস' মুর্শিদাবাদের এক প্রাচীন জনপদ ঃ একটি পর্যালোচনা

ফারুক আব্দুল্লাহ

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে প্রচুর প্রাচীন জনপদ এবং তাদের নানান ইতিহাস। এমনই একটি বিস্মৃত প্রায় জনপদের নাম গোয়াস।



বর্তমানে জনপদটি ডোমকল মহকুমার অধীন ইসলামপুর থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। জনপদটি জেলার সদর শহর বহরমপুর থেকে প্রায় ৩০ কিমি. পূর্বে বহরমপুর-সাগরপাড়া রাজ্য সড়কের দুই পাশে অবস্থিত।

কথিত আছে যে, ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর হঠাৎ নদীয়া আক্রমণে তৎকালীন বাংলার সেন রাজবংশের রাজা লক্ষণ সেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রাজধানী নবদ্বীপ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। সেই সময় রাজাকে অনুসরণ করে বেশ কিছু প্রজা নদীপথে এবং হাটা পথে দেশ ত্যাগ করেছিলেন বলে জানা যায়। এই সব প্রজাদের মধ্যে কিছু উচ্চবর্গের ও উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য পরিবার ভাগীরথী নদী অতিক্রম করে ভৈরব নদীর পূর্ব পাড়ে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে এই জনবসতিটিই গোয়াস নামে পরিচিত হয়। এই সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে বশিষ্ঠ গোত্রীয় চন্দ্র বংশীয় বৈদ্যগণ একটি নতুন সমাজ গঠন করেন। পঞ্চদশ শতকে এই বৈদ্য সমাজের মধ্যে থেকেই জনার্দন সেন নামে এক ব্যক্তি এই এলাকায় জমিদারীর পত্তন করেন।

এই জনপদটির নাম 'গোয়াস' কেন হল তা নিয়ে বেশ কয়েকটি মত প্রচলিত রয়েছে। ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ের অঞ্চলকে বাগড়ী বলা হয়। এই অঞ্চলের ভূমি রাঢ় অঞ্চলের ভূমি অপেক্ষা নিচু, বেলে বা দোআঁশ মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত তাই অনুমান করা হয় যে এই জনপদটিতে দোআঁশ পলিমাটির অধিক্যের জন্যই অঞ্চলটির নাম বিকৃত হয়ে গোয়াস নামকরণ হয়। অপর একটি মত অনুসারে এখানে গো-সম্পদের চাষ ও 'দোআঁশা ফল' (যে ফল বছরে দুই বার হয়) এর আধিক্য দেখেই নাকি গ্রামের নাম রাখা হয় গোয়াস। কিন্তু এই মতামতগুলির কোনটি সত্য সে সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায়না।

খাজা নিজামউদ্দিন আহমেদের তবাকাৎ-ই-আকবরী থেকে জানা যায় যে, মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে তার সমগ্র সম্রাজ্য ৩২০০ টি কসবা বা শহরে বিভক্ত ছিল। (তুর্কী ও উর্দুতে কসবা বলতে এমন এক জনপদকে বোঝায় যেটি গ্রামের থেকে বড়ো ও নগরের থেকে ছোটো অর্থাৎ শহর)। যার মধ্যে মুর্শিদাবাদের বাগড়ী অঞ্চলে ছিল দুটি একটি ভগবানগোলার বাহাদুরপুর এবং অন্যটি ইসলামপুরের গোয়াস। বর্তমানেও এই 'কসবা' নামটি গোয়াস নামের সাথেই জুড়ে রয়েছে।

পঞ্চদশ শতক থেকেই গোয়াস বাংলার একটি পরিচিত গ্রাম। পরিচিতি আছে বৈষ্ণবধর্মের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে। চৈতন্যদেব তার অন্যতম সহচর শ্রীনিবাস আচার্যকে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্যের সময় থেকেই মুর্শিদাবাদে বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে মুর্শিদাবাদে যে তিনটি অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, গোয়াস ছিল তার অন্যতম। গোয়াসের বোরাখুলী গ্রামে এক বিরাট মহা উৎসব ও সংকীর্তনের অবতারণা হয় সেই সময়। এই মহাসম্মেলনকে কেন্দ্র করেই সমগ্র বাংলায় গোয়াস গ্রামের নাম ছড়িয়ে পড়ে, এছাড়া প্রতিবছর বর্তমান বাংলাদেশের

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▶

নতুন গ্রামের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ঃ স্থাপত্য, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নানা কথা, নানা দিক

শুভম মুখোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্তসার ঃ

বাঁকুড়ার মন্দির মানচিত্রে শুশুনিয়ার কাছ নতুনগ্রামের মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। যদিও এই মন্দির নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা এতদিনেও হয়নি। স্থাপত্য ও টেরাকোটার সজ্জার দিক দিয়ে মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য শুধু মন্দির নয়, মন্দিরের সাথে সাথেই দেবতা সম্পর্কিত নানা লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের ইতিহাস ও পুঁথিপত্র, সংস্কৃত চর্চা বিষয়ে এই প্রবন্ধে ক্ষেত্রসমীক্ষা সমৃদ্ধ আলোকপাত করা হয়েছে।

সূচক শব্দ ঃ নতুনগ্রাম, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, কাঞ্চীনাথ গোস্বামী, বিষ্ণুপুরী আটচালা, টেরাকোটা, ধাতব রথ, পুঁথিপত্র।

নতুন যে গ্রাম --- সমাসের বিচারে সেই গ্রামের নামই 'নতুনগ্রাম'। বাংলার বহুস্থানেই এই 'নতুনগ্রাম' নামের গ্রাম দেখা যায়। তবে নাম 'নতুনগ্রাম' হলেও তা যে 'নতুন'ই হবে, তা সবসময় ঐতিহাসিকভাবে সত্য নাও হতে পারে। অনেক 'নতুনগ্রামে'ই দেখা যায় শতশত বৎসরের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকাশের ধারা। বাঁকুড়া জেলাতেও 'নতুনগ্রাম' নামের গ্রাম সংখ্যা নেহাত কম নয়। এদের মধ্যে অনেক গ্রামই বেশ 'নতুন', আবার অনেক গ্রামেই প্রাচীনত্বের নিদর্শন বিদ্যমান। যেমন --- গঙ্গাজলঘাটী থানার লছমনপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত নতুনগ্রাম। শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রামটি টেরাকোটা-সমৃদ্ধ প্রাচীন মন্দিরকে বুকে আগলে প্রাচীনত্বের দাবী করে আসছে।

(১)

রাঢ় অঞ্চলের ইতিহাসে এক বিস্তরকাল জুড়ে রাজত্ব করেছিলেন পঞ্চকোটের রাজারা। পঞ্চকোট বা শিখরভূম নামে খ্যাত এই রাজ্য ছিল পুরুলিয়ার বহুলাংশ, বাঁকুড়ার উত্তর-পশ্চিমাংশও ঝাড়খণ্ডের বেশকিছু অংশ জুড়ে বিস্তৃত। এই বৃহৎ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি থেকে আদিবাসী-ভূমিজ সংস্কৃতিই বেশি প্রভাবশালী। পঞ্চকোটের রাজারা রাজপুতনার ধার অঞ্চলের ক্ষত্রিয় বলে দাবী করলেও নৃতাত্বিক বিশ্লেষণেই বোঝা যায়, অন্যান্য ভূমরাজ্যের রাজাদের মত এরাও ভূমিজ সংস্কৃতি



থেকেই আবির্ভূত। যাই হোক, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বহির্ভূত এই অঞ্চলে মোটামুটি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক থেকেই ব্রাহ্মণাগম শুরু হয়। অনেক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শিখর রাজাদের কাছে জমিজমা বন্দোবস্ত পেয়ে শিখরভূমের বিভিন্ন স্থানে বসতি শুরু করেন। অবশ্য শুধু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণরাই নয়, বহু দক্ষিণাগত ও পশ্চিমাগত ব্রাহ্মণ বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন প্রয়োজনে শিখরভূমে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। শিখর রাজাদের 'আচার্য' উপাধিক গুরুবংশও দক্ষিণাগত ব্রাহ্মণ। প্রথমগুরু আচার্য রঙ্গরাজ বেড়ো গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং রাজারা গুরুসেবার জন্য ৫৭ মৌজা অর্পণ করেন। অনেকেই মনে করেন শিখরভূমের এই গুরুবংশ চৈতন্যপার্ষদ ও ষড়গোস্বামীর অন্যতম গোপালভট্টের বংশধর। আবার একটি প্রাচীন পাতড়া থেকে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য ও ষড়গোস্বামীর প্রধান দুই হোতা রূপ ও সনাতনের পূর্বপুরুষ রুপেশ্বর কর্ণাট দেশ ত্যাগ করে এই শিখর ভূমেই বসতি স্থাপন করেছিলেন। এই কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণকে শিখরেশ্বর পঞ্চগ্রাম ব্রক্ষোত্তর সম্পত্তি প্রদান করেছিলেন। তাঁর পুত্র পদ্মনাভ পরবর্তীকালে শিখর দেশ ত্যাগ করে কুমারহট্টে স্থিত হয়েছিলেন।

এই শিখর রাজ্যে বেশ কিছু পশ্চিমদেশাগত ব্রাহ্মণও রাজপ্রদত্ত ভূসম্পত্তি পেয়ে বসবাস করতে থাকেন। এঁরা সমাজে পশ্চিমাব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। ক্রমে তা লোকমুখে 'পচ্ছা বাউন' হয়ে দাঁড়ায়। নতুনগ্রামের প্রধান বংশ যে গোস্বামী পরিবার, এরাও হল পশ্চিমাব্রাহ্মণ। বর্তমান বংশধরদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এঁদের পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান হল উত্তরপ্রদেশের ধারনগর। সেখান থেকে চারজন ভাই শিখরভূমে আসেন। বর্তমান শালতোড়ার সালমা গ্রামে তাঁরা কিছুদিন বসবাস করে খাজুড়ি গ্রামে আসেন। পরে খাজুড়ি গ্রাম ত্যাগ করে পাকাপাকিভাবে তাঁরা নতুনগ্রামে আসেন। শিখরভূমের রাজারা তাঁদের নতুনগ্রামটি ব্রক্ষোত্তর সম্পত্তি হিসাবে প্রদান করেন। এর পূর্বে বোধ হয় এই স্থান বসতিহীন ছিল, গোস্বামীর নতুন বসতি স্থাপন করলে স্থানের নাম হয় 'নতুনগ্রাম'। তবে খাজুড়ি বসবাসের স্মৃতিস্বরূপ তাঁদের 'খাজুড়ির গোঁসাই' বলা হয়। পূর্বে তাঁদের কী পদবী ছিল তা জানা যায় না, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জিউ সেবাপুজার জন্য তাঁদের 'গোস্বামী' পদবী প্রাপ্ত হয়। এঁদের গোত্র শাণ্ডিল্য, এঁরা যজুর্বেদাধ্যায়ী।

(২)

নতুনগ্রামের প্রাচীনত্বের প্রধান দাবীদার শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জিউয়ের মন্দিরটি। যদিও দুঃখের বিষয়, বাঁকুড়া জেলার মন্দির বা পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত কোনও গ্রন্থে এই মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু মন্দিরটি নানা দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য। এই অংশে আমরা মন্দিরের রীতি-প্রকৃতি ও টেরাকোটা অলংকরণ বিষয়ে আলোচনা করব।

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটি বাংলার চিরাচরিত আটচালা বাড়ির অনুকরণে নির্মিত। মন্দির রীতির ক্ষেত্র এই আটচালারীতিটি বাংলার একান্তই নিজস্ব শৈলী। তবে স্থানভেদে আটচালা শৈলীরও ইতর-বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। এই প্রভেদ লক্ষ্য করেই প্রখ্যাত মন্দিরতত্ত্ববিদ ডেভিড ম্যাকাচ্চন সাহেব এই আটচালা শৈলীকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। তারমধ্যে নতুনগ্রামের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটি 'বিষ্ণুপুরী আটচালা' শৈলীতে নিবন্ধ। 'বিষ্ণুপুরী আটচালা'র নিচের বৃহৎ চারচালা ও উপরের ক্ষুদ্র চারচালার মধ্যে স্থানটি সংকীর্ণ। ফলে দূর থেকে তা চারচালা মন্দিরের মত দেখায়।

মূল মন্দিরটি উচ্চভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্গাকার মন্দিরটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৬ মিটার, উচ্চতায় প্রায় ৯ মিটার। প্রবেশ পথ ত্রিখিলান, ফুলকাটা আকৃতির। খিলান স্তম্ভ, গর্ভগৃহের ভেতর ও বহিরাংশে উন্নতমানের পঙ্খের প্রলেপে আবৃত। গর্ভগৃহ ও বাইরের খিলানের মাঝে ছোট বারান্দা। প্রবেশ দ্বারের তিনটি খিলানের উপরি অংশে টেরাকোটা মূর্তি ও প্রস্ফুটিত পদ্মের অলংকরণ দেখা যায়। সেগুলিও পঙ্খের প্রলেপে আবৃত ছিল। আটচালা রীতির মন্দিরটির শীর্ষে রয়েছে আমলক, কলশ ও চক্র।

কেবলমাত্র মন্দিরের সম্মুখভাগেই আছে টেরাকোটা অলংকরণ। মূলত রামলীলা ও কৃষ্ণলীলাই এর প্রধান বিষয়। ত্রিখিলানের মধ্যবর্তী খিলানের উপরি অংশে রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা করা হয়েছে। রাম-রাবণের ঠিক মাঝখানে এক ব্যক্তিকে জোড় হাতে দেখা যায়। সম্ভবত তিনি কোন সাধুপুরুষ। রাবণের পক্ষে যুদ্ধরত রাক্ষসগণ অনেকটাই রাজবেশে অলংকৃত। এমন কি মাথার মুকুট পর্যন্ত মোগল নবাবের মত। ডানদিকের খিলানের উপরে কৃষ্ণের নৌকাবিলাস ও গোচারণ দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও এই অংশের দধিভাণ্ড মাথায় নিয়ে গোপাঙ্গনাদের দৃশ্যটি বেশ জীবন্ত। এখানেও এক সাধু পুরুষকে জোড়হাতে দেখা যায়। বামদিকের খিলানের উপর কৃষ্ণের বস্ত্রহরণলীলা ও রাসলীনা দেখানো হয়েছে। বস্ত্রহরণে নগ্ন গোপীগণ একহাতে লজ্জা অঙ্গ ঢেকে অন্যহাতে গাছে বসে থাকা বংশী-বাদনরত কৃষ্ণের কাছে বস্ত্র প্রার্থনার দৃশ্যটি বেশ স্বাভাবিক। রাসমণ্ডলটি ক্ষুদ্র, সুক্ষতা বর্জিত। এই অংশে হরিণের সাথে এক মহিলাকে দেখা যায় — দৃশ্যটি দেখলেই শকুন্তলার কথা মনে পড়ে। তিনটি খিলানের মাঝের দুটি স্তম্ভের উপর একটিতে দুগ্ধমন্থনরত যশোদা ও কৃষ্ণের চিত্র আছে। অন্যটিতে একজন পদ্মাসনে উপবিষ্ট জোড় করে এক ব্যক্তির মূর্তি দেখা যায়। স্থানীয়রা বলেন, উনিই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলার মন্দিরে মন্দিরে টেরাকোটার রাজ্যে এরকম প্রতিষ্ঠাতার মূর্তি বিরল। তাই ফলকটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনটি খিলানেই একাধিক প্রস্ফুটিত পদ্মের অলংকরণ দেখা যায়। এর অনেকটাই শূন্যস্থান ভরানোর কৌশল বলেই মনে হয়।

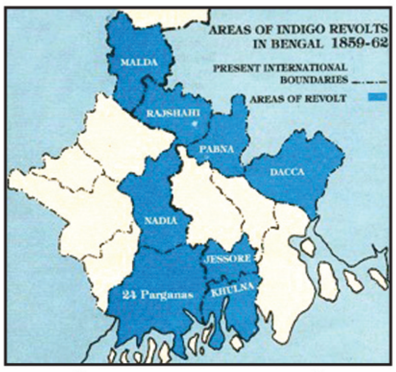
ডানদিক ও বামদিকের খিলানের পাশে উপর থেকে নিচ বরাবর ১১টি করে খোপে টেরাকোটা ফলক দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। এরমধ্যে উভয় দিকে তিনটি করে খোপে প্রস্ফুটিত পদ্ম আছে, বাকিগুলিতে দশাবতারের কিছু মূর্তি বসানো হয়েছে। লক্ষ্যনীয় বিষয়, এখানে দশাবতারের মূর্তি বুদ্ধ কল্কির মূর্তিগুলি নেই। আবার বামন, নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারের দুটি করে মূর্তি দেখা যায়। মূর্তিগুলি ক্রম অনুসারেও সজ্জিত নয়। এ ব্যাপারটি খুবই আশ্চর্য করে। শিল্পী ও প্রতিষ্ঠাতা

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▶

নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহ ঃ বারাসাত

সৌরভ বারুই

ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই নীল চাষের প্রচলন ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে নীল রংয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনু তাঁর শাস্ত্রে নির্দেশ দিয়েছেন কোনো ব্রাহ্মণরা নীল ব্যবসা করতে পারবেন না। নীল হিন্দুস্থান বা ইণ্ডিয়া থেকে রপ্তানি হত বলেই নীল কে গ্রীসে ও রোমে "ইণ্ডিগো" (Indigo) বা ইণ্ডিকম (Indicum) বলা হত। পাণিনির লেখাতে রঙ রূপে "নীল"-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্লিনির (Pliny) লেখা এবং "Periplus of the Erythraean Sea" থেকে জানা যায় যে, সিন্ধু নদের তীরে অবস্থিত বারবারিকন্ বন্দর থেকে ইণ্ডিগো বিদেশে চালান যেত। মধ্য যুগেও নীল





চাষের নিদর্শন মেলে। বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কো পোলো ভারতে এসে দেখেন ত্রিবাঙ্কুর রাষ্ট্রে কোলিয়াম নামক বন্দরে প্রচুর পরিমানে নীল প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং তা বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায়, আগ্রার নিকট বায়নাতে ও গুজরাটের অন্তর্গত আহমদাবাদে উৎকৃষ্ট নীলের চাষ করা হত। সেকালে নীল ভারত থেকে পারস্য উপসাগর থেকে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর হয়ে ইউরোপে পৌছাত। কিন্তু বাংলায় কবে থেকে নীল চাষ হত তার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। আইন-ই-আকবরী -তে বাংলায় নীল চাষের উল্লেখ না থাকায় অনেকে মনে করেন মধ্য যুগেও বাংলায় নীল চাষ হত না, বাংলায় নীল চাষের আগমন ইংরেজ আগমনের পরে।

১৬৬০ সালের পূর্বে ইউরোপের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা নীল প্রস্তুত করতে জানত না। তারা অন্য দেশগুলি থেকে নীল আমদানি করত। তারা নিজেরা ভোড নামে এক প্রকার রঙ ব্যবহার করত। কিন্তু ভোডের উজ্জ্বলতা ও রঙ নীলের মত ওত ভালো ছিল না। ১৬৬০ সালে দ্বিতীয় চার্লস বেলজিয়ম থেকে কয়েকজন রঞ্জক আনিয়ে নীল চাষের পদ্ধতি শেখাবার ব্যবস্থা করেন। ফলে ব্রিটিশ-রাই এবার নীল প্রস্তুত করতে শুরু করল। এদিকে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলা ইংরেজদের দখলে চলে গেল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি লাভের পর বাংলার বাগিচা ফসলের চাষ আবাদ কোম্পানির দায়িত্বেই হত। কিন্তু নীলকর সাহেবরা দেওয়ানি লাভের পূর্বে বাংলায় নীল চাষ করার অনুমতি পেত না। এখানে ব্যবসা করার জন্য সরকারের কাছ থেকে তাদের "লাইসেন্স" (License) নিতে হত। এরপর কোম্পানি অবাধ বাণিজ্য চালু করলে বাংলায় নীলকরদের আগমন বেড়ে যায় এমনকি সরকারি কর্মচারীরাও চাকরি ছেড়ে নীল ব্যবসায় মুনাফার লোভে নীলকর সাহেবে পরিণত হতে থাকে। তাঁরা প্রথমে কলকাতার ধনী ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বেনামীতে জমি কিনে ব্যবসা শুরু করে। ১৮৪৮ সালের "Calcutta Review" পত্রিকায় এক ইংরেজের লেখা থেকে জানা যায়, নীলকর সাহেব-রা প্রথমে নিজেদের সুবিধা মত ৫০-১০০ বা তার বেশি জমি কেনার চেষ্টা করত, তারপর কতগুলি গামলা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দিয়ে তাদের ফ্যাক্টরি (Factory) স্থাপন করত। বলা বাহুল্য ফ্যাক্টরির জমি, এমনকি ফ্যাক্টরি পর্যন্ত থাকত বেনামীতে। নীলকররা খুব কম জমিতেই তাদের দায়িত্ব কায়েম করতে পেরেছিলেন। সাধারণত চাষীদের দাদন দিয়ে তাদের জমিতে তাদের দিয়েই নীল চাষ করিয়ে নিত। দাদন দেবার সময় চাষীদের চুক্তিপত্রে সই করতে হত যে, চাষীরা এতটা জমিতে নীল চাষ করবে এবং নির্দিষ্ট মূল্যে ওই নীল গাছ নীলকর সাহেবদের বিক্রি করবে। নীলকর সাহেবের অনেকেরই নিজেদের জমি ছিল। সেক্ষেত্রে তাঁরা বাঁকুড়া, বীরভুম, মালভূম, সিংভূম থেকে সাঁওতালদের নিয়ে আসত। সাঁওতালরা সাধারণত সপরিবারে আসত, তারা কুঠির কাছে জমিতে কুড়ে ঘর করে থাকত। সে সময়ে নীল ৩০-৪০ টাকা প্রতি মন হিসেবে নীল বিক্রি হত। চাষীরা (যে চাষীদের জমি ছিল) পেতেন মাত্র ৪-৫ টাকা (প্রতি মন)। সাঁওতাল পুরুষ মজুরদের দর ছিল মাসে ৩ টাকা আর মেয়ে এবং বালক মজুরদের মাসে দু টাকা করে দেওয়া হত। নীলকল সাহেবরা নীল চাষে একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন। তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কাজ করার জন্য ম্যানেজার রাখতেন। ম্যানেজাররা ব্যবসা দেখাশুনা করত। সেকালে বনমালী চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি বারাসাতের দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নামেই পরবর্তীকালে বারাসাতের একটি গ্রাম বনমালীপুর নামে পরিচিত লাভ করে। *(ক্রমশ)*

▶ ২ পৃষ্ঠার পর

'গোয়াস' মুর্শিদাবাদের এক প্রাচীন জনপদ ঃ একটি পর্যালোচনা

খেতুরিতে বৈষ্ণবদের একটি বিরাট সম্মেলন হত, সেই সম্মেলনে যোগদান করতে যে সব বৈষ্ণব সাধক ও বৈষ্ণব প্রধানেরা যেতেন তারা প্রত্যেকেই 'শ্রীপাট গোয়াসে' পদার্পণ করতেন এবং কিছুদিন গোয়াসে বিশ্রাম নিয়ে জনপদের ভেতরে দিয়ে প্রবাহিত 'গোমানী' নদী পথ ধরে পদ্মা হয়ে খেতুরী সম্মেলনে পৌঁছতেন। বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্তী গোপীরাম দাস এবং চৈতন্যোত্তর যুগের বাৎসল্য রসের শ্রেষ্ঠ কবি বলরাম দাসের জন্মভূমিও ছিল এই গোয়াস। গোয়াসের বোরাখুলীতে রাধাবিনোদ নামে এক বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে এবং সেই প্রতিষ্ঠা উৎসবে বহু বৈষ্ণব মহাপুরুষগণ যোগদান করে উৎসবকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন বলে জানা যায়, পরবর্তীতে গোয়াস থেকে বৈষ্ণবধর্ম পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। *(ক্রমশ)*

▶ ৩ পৃষ্ঠার পর

নতুন গ্রামের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির

দুজনেই কি এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছিলেন, না অন্যকোন কারণ? — এ সম্বন্ধে ধোঁয়াশা থেকে যায়। এই অংশে দুদিকে বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় ও বিজয়ের মূর্তি আছে।

মন্দিরের টেরাকোটাগুলি পঙ্খের প্রলেপে ঢাকা ছিল। যদিও বর্তমানে খুব কম অংশেই এই প্রলেপ বর্তমান আছে। বঙ্গের মন্দিরের ইতিহাসে টেরাকোটার হাজার হাজার বছর ধরে পঙ্খের ব্যবহার হতে দেখি। মুসলিম-পূর্ব যুগের দেউল হিসাবে খ্যাত বহুলাড়া, সোনাতপলের মন্দিরেও ইটের উপর পঙ্খের অলংকরণ দেখা যায়। পরবর্তীকালে মল্ল আমলেও রাসমঞ্চ সহ অন্যান্য মন্দিরে পঙ্খের ব্যবহার হয়েছে। মন্দিরতত্ত্ববিদ অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, পরবর্তীকালে টেরাকোটার শৈল্পিকমানের অবনতিতেই তার উপর 'চুনবালি' বা পঙ্খের ব্যবহার হয়েছে।[৭] লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটির ক্ষেত্রেও আমরা দেখি টেরাকোটা মূর্তিগুলি যথেষ্ট অমসৃণ, সূক্ষ্মতাবিহীন বা মোটাদাগের। তাই মনে হয়, এই ত্রুটি ঢাকবার জন্যই পঙ্খের প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল।

এবার আসি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকালের কথায়। মন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠালিপি পাওয়া যায়নি। তাই সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয় যে কে, কত সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। যদিও মন্দিরের টেরাকোটা ও অন্যান্য গঠনশৈলী দেখে অনুমিত হয়, আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে বা ঊনবিংশ শতকের প্রথম পর্বে এই মন্দির নির্মিত হয়ে থাকবে। পারিবারিক ঐতিহ্য সূত্রে জানা যায়, এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কাঞ্চীনাথ গোস্বামী। পূর্বে উল্লিখিত একটি টেরাকোটা ফলকও প্রতিষ্ঠাতার বলে অনুমিত হয়। যদিও কাঞ্চীনাথ গোস্বামীর সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবু জনশ্রুতিকে অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়াও ঠিক নয়। *(ক্রমশ)*

প্রধান সম্পাদিকা ও প্রকাশক - সহেলী চক্রবর্তী (৮৯৪২৯২৪২৩৪), প্রশ্নচিহ্ন হইতে প্রকাশিত।
উপদেষ্টামণ্ডলী - ড. অধ্যাপক রাজর্ষী চক্রবর্তী, ড. স্বপন ঠাকুর, জনাব সুবিদ আবদুল্লা, জনাব ফারুক আবদুল্লা। অক্ষর বিন্যাস - শুভ্রজ্যোতি তালুকদার (৯৭৩৪৩১৪৫৬৮)